স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b
1960-2010
50 YEARS SAVING LIVES

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

সংলাপ রিপোর্ট

কলেরার জীবাণু যে-প্রক্রিয়ায় ভয়াবহ হয়ে ওঠে তা আবিষ্কার করেছেন আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানীগণ

বাম থেকে ডানে: অ্যাসিস্ট্যান্ট সায়েন্টিস্ট ড. এম কামরুজ্জামান, মলিকুলার জেনেটিক্স বিভাগের প্রধান ড. এসএম ফারুক ও রিসার্চ অফিসার ফাইজুল হাসান

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)-র মলিকুলার জেনেটিক্স বিভাগের প্রধান ড. শাহ্ এম ফারুক-এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন কী জৈবিক প্রক্রিয়ায় আপাতনিরীহ একটি জীবাণু মারাত্মক ডায়রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়—সাধারণত যাকে আমরা কলেরা বলে জানি। এই রোগের ফলে সারা বিশ্বে, বিশেষত দরিদ্র দেশসমূহে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

কখন কীভাবে কলেরা সৃষ্টিতে সক্ষম *ভিব্রিও কলেরি*-নামক জীবাণুর নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে, মানুষকে আক্রমণ করে অসুস্থ করে তুলবে এবং জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়বে এ-সম্পর্কে পূর্বধারণা তৈরিতে এই যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সারা বিশ্বে বিশাল অবদান রাখবে।

ড. শাহ এম ফারুকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল *ন্যাচার*-এ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই জার্নাল কেবল যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাহিনীই প্রকাশ করে থাকে। বোস্টনে অবস্থিত হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ড. জন ম্যাকালেনোস এই গবেষণায় সহযোগিতা করেন। *ন্যাচার*-এ প্রকাশিত হওয়ার পর এ-দেশের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় এই আবিষ্কারের কাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছে।

এই বিজ্ঞানী দল ব্যাখ্যা করেছেন কী প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়াসমূহ কিছু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে একধরনের বিষাক্ত দ্রব্য তৈরিতে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং পরিপাকতন্ত্রের কোষের সঙ্গে পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর পানি ও খনিজ লবণ নিঃসৃত করে—যাকে আমরা ডায়রিয়া বলে থাকি। যদিও এ-রোগ সম্পর্কে আগেই আমাদের কমবেশি জানা আছে, ড. ফারুক ও তাঁর সহকর্মীগণের গবেষণায় এ-সংক্রান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়েছে এবং কী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের বিক্রিয়ার ফলে কলেরার জীবাণু ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তা আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। টিএলসি ফাজ নামের যে নতুন ভাইরাস এই গবেষক দল চিহ্নিত করেছেন তাতে একটি জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। এসব ভাইরাসের মাধ্যমে কলেরা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া প্রাকৃতিকভাবে সংকেত পায় কখন কী করে প্রাকৃতিক আবাসস্থল ছেড়ে মানুষের পরিপাকতন্ত্রের মতো বিরূপ জায়গায় আশ্রয় নিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হবে।

ড. শাহ্ এম ফারুক বলেছেন, "আমরা টিএলসি ফাজ আবিষ্কার করে তাদের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছি এবং জেনেছি এগুলো কী করে, কিছুটা সূক্ষ্ম হলেও, কলেরা ব্যাকটেরিয়ায় ক্রোমোজোম-সংক্রান্ত পরিবর্তন ঘটায়। এই সূক্ষ্ম ও জটিল পরিবর্তন নতুনভাবে-আসা বিষাক্ত সিটিএক্স ফাজ জেনোমকে জায়গা করে দেয় এবং *ভিব্রিও কলেরি*-নামক আপাতনিরীহ কলেরার জীবাণু ভয়াবহ প্রাণঘাতী রূপ ধারণ করে। আমরা আশা করি আমাদের গবেষণার ফলাফল মানুষের জীবন রক্ষায় সহায়ক হবে এবং জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণায় সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে।"

আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালক ড. আলেহান্দ্রো ক্যাভিওটো-র মতে, *ন্যাচার*-এর মতো জার্নালে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাটি প্রথমত সাক্ষ্য দেয় আইসিডিডিআর,বি-তে পরিচালিত গবেষণা কতটা উচ্চমানের, দ্বিতীয়ত এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে বিজ্ঞানের নতুন-নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করছে, কীভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরছে—এবং এর চেয়েও বড় কথা—কীভাবে সেগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব তার পথ দেখাচ্ছে, এটি তারও একটি উদাহরণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় দশ লক্ষ লোক কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং এর মধ্যে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। জিম্বাবুয়ে ও মোজাম্বিকের মতো আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির আশপাশের বহু দেশে, পাকিস্তানের বন্যা-কবলিত এলাকায় এবং হাইতিতে সংঘটিত সাম্প্রতিক মহামারীতে এ-রোগের ক্রমবর্ধমান বিপদের আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে এ-রোগ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার জন্য ড. ফারুক ও তাঁর সহকর্মীদের পরিচালিত গবেষণার মতো কাজের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

এই গবেষণার বিস্তারিত তথ্যের জন্য *ন্যাচার*-এর নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন:

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature09469.html

ভেতরের পাতায়

- শিশুর বিকাশে বাবা-মায়েরা কতটুকু অবদান রাখতে পারছেন
- আয়োডিন ঘাটতিজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা
- আপনার শিশুর জন্মগত হৃদরোগ আছে কি না কী করে বুঝবেন
- নবজাতকের জন্ম-ওজন কম হলে কী করবেন

বর্ষ ১৯ | সংখ্যা ২

অগ্রহায়ণ ১৪১৭ | নভেম্বর ২০১০

ISSN 1021-2078

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এমএ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সিদ্দিক প্রিন্টার্স, ঢাকা

শিশুর বিকাশে বাবা-মায়েরা কতটুকু অবদান রাখতে পারছেন

ফাহ্‌মিদা তোফায়েল, ফারদীনা মেহরীন, আফরোজা হিলালী, জেনা ডি হামাদানী
আইসিডিডিআর,বি

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। এই চলমান পরিবর্তনের স্রোত বদলে দিচ্ছে আমাদের জীবনধারা। অনেক বেড়ে গেছে আমাদের দায়-দায়িত্ব। জীবনের তাগিদে আজকালকার আধুনিক বাবা-মা হিসেবে আমাদের যেমন সামলে চলতে হচ্ছে বহির্মুখী কর্মকাণ্ড, তেমনি দক্ষতার সাথে সামলাতে হচ্ছে ঘর-সংসার ও শিশু প্রতিপালনের মত গুরুদায়িত্ব। বাবা-মায়েরা শিশুর শারীরিক বিকাশ নিয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকলেও তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রটা অনেকখানি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

এই সময়টাতে শিশুর বিকাশে কে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, শিশুর বিকাশের কোন কোন ক্ষেত্রে এসময় লক্ষ রাখা প্রয়োজন, কিভাবে শিশুদের বিকাশে সহায়তা করা সম্ভব, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কি সত্যিই পরবর্তী কালে তার জীবন যাপনের মান উন্নত করে কি না এসব খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের আলোকে নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়:

শিশুর জীবনে গর্ভ থেকে শুরু করে জন্মের পর প্রথম ৩ বছর কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

অসংখ্য গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে দেখা গেছে: শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ আরম্ভ হয় মাতৃগর্ভ থেকেই। জন্মের সময় শিশুর মস্তিষ্কের (ব্রেইনের) প্রায় অর্ধেক অংশ তৈরি হয়ে যায়। মজার বিষয় হলো: স্নায়ুকোষের সংখ্যা এসময়েই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং ৪ বছর বয়সের মধ্যে মস্তিষ্কের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী কালে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি নির্ভর করে

গর্ভ থেকে শুরু করে জন্মের পর প্রথম ৩ বছর—অর্থাৎ লেখাপড়া শুরু করার আগের সময়টুকু—একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অথচ দেখা যায়: আধুনিক কালের অনেক শিশু এই সময়টাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্দীপনা বা স্টিমুলেশন ও স্বজনের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়—যা পরবর্তী কালে সৃষ্টি করে নানা ধরনের জটিলতা, যেমন আচরণে অস্বাভাবিকতা, লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, খাওয়া-দাওয়ার প্রতি অনীহা, ইত্যাদি।

একটি শিশুর জীবনে গর্ভ থেকে শুরু করে জন্মের পর প্রথম ৩ বছর কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, মূলত স্নায়ুকোষের সংযোগ বৃদ্ধি ও কোষগুলোতে মাইলিন (myelin)-এর আস্তর পড়ার ওপর। এর ফলে, স্নায়ুকোষগুলো সুচারুরূপে কাজ করতে পারে। এসময়ে শিশুর মস্তিষ্ক অতি দ্রুতহারে বৃদ্ধির পায় এবং তা সবধরনের উদ্দীপনা বা স্টিমুলেশন গ্রহণ করার জন্য তৈরি থাকে। যে-তথ্য বা অভিজ্ঞতাই সে অর্জন করে, সেটাই মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে গেঁথে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই কোনো কষ্ট ছাড়াই শিশুরা ছোট বয়সে তিন-চারটা ভাষাও অবলীলায় শিখে ফেলে। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক একটি মানুষকে কোনো নতুন ভাষা শিখতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয়।

শিশুর বিকাশে কারা সবচাইতে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে

জন্মের পর থেকে শিশুর চারপাশের পরিচিত লোকেরাই তার বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে মা-বাবার ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান কারণ বাবা-মা সন্তানের সাথে অনেকটা সময় কাটান, তাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন, সর্বদা তাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং তাদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারেন। তাই সন্তানরাও বাবা-মায়ের ওপর ভরসা ও নির্ভর করে। শিশুরা অনেক সময় তাদের বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-বোনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে। তবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে: অন্য শিশুর কাছ থেকে শেখার চেয়ে বড়দের সহযোগিতার মাধ্যমে কোনোকিছু শিখলে শিশুদের বিকাশ বেশি হয়। বর্তমান যুগে পরিস্থিতি অনেক সময় এমন হয়ে যায় যে, বাবা-মা দু'জনকেই জীবিকার জন্যে কাজে বের হতে হয়। ফলে, শিশুকে দেবার মত যথেষ্ট সময় তাদের থাকে না। অনেকেই নির্ভর করেন কাজের মানুষের ওপর। এজন্য যতটুকু সময়ই তারা শিশুর কাছে থাকতে পারেন সে-সময়টাকে 'মানসম্মত সময়' করে তুলতে পারলে সেটা শিশুর বিকাশে অনেক অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে মায়ের সাথে বাবাকেও অনেকখানি সহযোগী হতে হবে। অথচ আমাদের সমাজে বাবারা সন্তানদের লালন-পালনের জন্য রোজগার করাটাকেই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন। এর বাইরে সন্তানদের সঠিক বিকাশে তাদের যে আরো অনেক ভূমিকা থাকতে পারে সে-বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নেই। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে: মা-বাবা দু'জনেই যেসব সন্তানকে উদ্দীপনা দান করেছেন তাদের মানসিক বিকাশ ও স্কুলের ফলাফল ওদের চেয়ে ভালো যারা কেবল একজন অভিভাবকের যত্ন পেয়েছে।

শিশুর বিকাশের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম ৩ বছর লক্ষ রাখা প্রয়োজন

পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টির পাশাপাশি নিচে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে বিকাশের সুযোগ করে দিলে শিশু যথেষ্ট উদ্দীপনা পাবে:

- ***শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন:*** শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া শিশুর বিকাশের প্রাথমিক ধাপগুলোর একটি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: ৬ মাসের একটি শিশুকে বিছানা বা চেয়ারে আটকে না-রেখে ওকে হামাগুড়ি দেবার মত সুযোগ করে দিলে সে তার মাংসপেশীগুলো সঞ্চালন করতে পারবে, তার পারিপার্শ্বিক জগতকে জানবে এবং ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলটি শিখবে। সেইসাথে তাদেরকে ছোট ছোট মাংসপেশীর সঞ্চালনের কাজগুলোও করতে

দিতে হবে, যেমন: গুটি-ধরা, বোতলে গুটি-ভরা, পেন্সিল দিয়ে দাগ-দেওয়া, ইত্যাদি। এতে চোখ ও হাতের সমন্বয়মূলক কাজগুলোতে দক্ষতা আসবে।

- ***পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে পরিচিতি ও ভাষার আদান-প্রদান:*** শিশুকে পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে পরিচিত করাতে হবে। সে বলতে পারুক বা না-পারুক তাকে বিভিন্ন জিনিসের নাম বলে-বলে চেনাতে হবে। মনের ভাব আদান-প্রদানে সহযোগিতা করতে হবে। শিশু নতুন-নতুন কথা শিখলে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তাকে উদ্দীপনা দিতে হবে। এতে শিশু আরো দ্রুত কথা বলতে ও মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখবে।
- ***মেলামেশা ও সামাজিকতা:*** শিশুকে সবার সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যদের সাথে মেলামেশা ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিশু সামাজিক হতে শিখে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে, সাধ্যমত তার নিজস্ব জগতের বিভিন্ন রকম সমস্যার সমাধান করতে শিখে।

যেভাবে শিশুদের বিকাশে সহায়তা করা সম্ভব

- ***ধৈর্য্যের সাথে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা:*** সবার আগে বাবা-মাকে খুব দক্ষতার সাথে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিশুর আগ্রহ-অনাগ্রহ, দক্ষতা, দুর্বলতা, ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের শিশুটি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে নিয়ে সে-অনুযায়ী উদ্দীপনা দিতে হবে।
- ***ধাপে-ধাপে কাজ শেখানো:*** শিশুর দক্ষতা ও বয়স অনুযায়ী তাকে ধাপে-ধাপে উদ্দীপনা দানের মাধ্যমে একের পর এক কাজ শেখাতে হবে। জানতে হবে: শিশু তার কাজটি করতে কতটা আগ্রহী এবং তা করে সে আনন্দ পাচ্ছে কি না। শিশুর জন্য এমন ধরনের কাজ বা খেলা নির্বাচন করতে হবে যা তার জন্য খুব কঠিন নয়, আবার খুব সহজও নয়। কারণ খেলা খুব সহজ হলে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে আবার খুব কঠিন হলে সে হতাশ হয়ে তা থেকে বিরত থাকতে পারে।
- ***খেলায় নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনা:*** শিশুরা খুব সহজেই কিছুক্ষণ খেলার পর ওই খেলনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই, যেধরনের জিনিস দিয়ে অনেক খেলনা বানানো যায় সেধরনের খেলনা দিয়ে তাকে উদ্দীপনা দিতে হবে। এতে শিশু আনন্দ পাবে এবং তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে।
- ***ভালোবাসা প্রকাশ করা, উৎসাহ দেওয়া ও প্রশংসা করা:*** শিশুর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে, প্রতিটি কাজে উৎসাহ দিতে হবে এবং কোনো কাজ পারলে প্রশংসা করতে হবে। এতে শিশুর শেখার উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।
- ***ভাষা শেখানো:*** শিশুর সাথে অনেক বেশি কথা বলতে হবে। তাহলে সে অনেক শব্দের সাথে পরিচিত হবে এবং কথা সাজিয়ে নিজে বলার চেষ্টা করবে। এটি তার ভাষাগত বিকাশে সহায়ক হবে।
- ***শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ানো:*** শিশুকে নিজে-নিজে কাজ করতে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বাবা-মার সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। কোনো কাজে বা খেলায় বারবার বাধা দিলে তার শেখার আগ্রহ কমে যাবে এবং সে নতুন কিছু করতে ভয় পাবে। এতে সে ভীতু ও লাজুক প্রকৃতির হয়ে উঠবে।
- ***খেলার ছলে মজা করে শেখানো:*** শিশুকে মজা আর আনন্দের সাথে কাজ শেখাতে হবে।

পড়ালেখার জন্য অল্পবয়সে চাপ দেওয়া যাবে না। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, যেমন ১, ২, ৩ গণনা; রঙের নাম; বস্তুর আকার, যেমন কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা লম্বা, কোনটা গোল; এবং অবস্থান, যেমন উপর-নিচ, ভিতর-বাহির, ইত্যাদি খেলার ছলে আনন্দের সাথে আশপাশের জিনিসের উদাহরণ দিয়ে শেখাতে হবে। এতে তার শেখার প্রতি আরো আগ্রহ বাড়বে এবং পরবর্তী কালে লেখাপড়ার প্রতি অনীহা জাগবে না।

- ***শিশুকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা:*** এ-বিষয়ে প্রথমেই শিশুকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কোনো ধরনের দুষ্টুমি করলে সে কেন তা করেছে সেটা আগে জানতে হবে। তারপর শিশুর পছন্দ-অপছন্দ বুঝে তাকে ধীরে-ধীরে নির্দিষ্ট কাজের দিকে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তুলতে হবে। বকা, মারধোর বা শাসন-করা শিশুর বিকাশের প্রবৃত্তিকে দমন করে দেয়। কোনকিছু করতে বারণ করলে তার কারণ শিশুর বোঝার উপযোগী করে তাকে বুঝাতে হবে।
- ***কথা-রাখা ও বিশ্বাস অর্জন:*** শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, বাবা-মা তার শুভাকাঙ্ক্ষী। শিশুর আস্থা অর্জনের জন্যে তাকে কোনো কথা দিলে সেটা রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে সবক্ষেত্রে সাহস দিতে হবে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ পরবর্তী কালে তার জীবন যাপনের মান কতটা উন্নত করে

জামাইকাতে ২০০৯ সালে পরিচালিত একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় দেখা গেছে: ৩ বছর বয়সের আগে যেসব শিশু সবধরনের উদ্দীপনা বা স্টিমুলেশন পেয়েছে তারা ২৫ বছর বয়সেও যারা তা পায় নি তাদের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশি ভালো করেছে। এছাড়া, তারা বুদ্ধির পরীক্ষায় এবং আত্মবিশ্বাসেও ভালো ফলাফল দেখিয়েছে।

"আজকের শিশু আগামীকালের নাগরিক"—এ-কথা মনে রেখে আমাদের সকলেরই উচিত শিশুদেরকে তাদের পূর্ণ বিকাশের জন্য সুযোগ করে দেওয়া, শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও তাদেরকে সময় দেওয়া, তাদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করা এবং তাদেরকে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করা। উদ্দীপনা বা স্টিমুলেশন দানের জন্য সবসময় কাছে থাকার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা সময় বের করে শিশুকে তার দক্ষতা বুঝে উদ্দীপনা দিলেই সে পরিপূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পাবে। তাই, বাবা-মা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে যে সময়টুকু শিশুর সাথে কাটান (যেমন খাবার সময়, খেলার সময়, ঘুমের সময়, গোসলের সময়, ইত্যাদি) তাকে করে তুলতে হবে শিশুর জন্য স্মরণীয় একটি বিশেষ ক্ষণ।

আয়োডিন ঘাটতিজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা

অঞ্জন কুমার রায়
আইসিডিডিআর,বি

আয়োডিন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে সহায়তা করে। আমাদের শরীর নিজে আয়োডিন তৈরি করতে পারে না। তাই আমাদেরকে খাবারের সাথে বাইরে থেকে এটা গ্রহণ করতে হয়।

আয়োডিনের উৎস

বেশিরভাগ আয়োডিন আমরা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয় থেকে পাই। সাধারণত সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। তাই সামুদ্রিক উৎস থেকে প্রাপ্ত খাবার, যেমন সমুদ্রের মাছ, আয়োডিনসমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কিছু শাকসব্জিতে, যেমন পালং শাক, বীট, আলু, টমেটো ও মরিচে, ভালোমাত্রায় আয়োডিন থাকে যদি সেগুলো আয়োডিনসমৃদ্ধ মাটিতে জন্মে। আবার কিছু সব্জি আছে (যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম) যেগুলো শরীরে আয়োডিন শোষণে বাধা দেয়। ফলে, এসব শব্জি বেশি খেলে শরীরে আয়োডিনের মাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বাদু পানিতে আয়োডিন খুব বেশি থাকে না। তাই স্বাদু পানির মাছেও আয়োডিন খুব বেশি থাকে না।

আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। থাইরয়েড হরমোনের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো আয়োডিন। থাইরয়েড হরমোন আমাদের শরীরে বিপাক-সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। থাইরয়েড হরমোন প্রধানত মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমুহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য।

আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যা

যখন আমাদের শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দেয় তখন প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হরমোন উৎপন্ন হয় না এবং আমরা আয়োডিনের অভাবজনিত নানা স্বাস্থ্যসমস্যায় ভুগি, যেগুলোকে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যা বা ইংরেজিতে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিজঅর্ডার (আইডিডি) বলা হয়ে থাকে। এসব সমস্যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

হাইপোথাইরয়ডিজম

আয়োডিনের অভাবে যখন আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয় না তখন তাকে হাইপোথাইরয়ডিজম বলা হয়। এর ফলে, আলসেমির ভাব, ঠাণ্ডা সহ্য করতে অক্ষমতা, অনিদ্রা, চামড়া শুস্ক হয়ে-যাওয়া, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

গলগণ্ড

আয়োডিনের ঘাটতির প্রাথমিক ও দৃশ্যমান লক্ষণ হলো গলগণ্ড রোগ। আমাদের গলদেশে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে তা যখন আয়োডিনের অভাবে ফুলে যায় তখন তাকে গলগণ্ড রোগ বলা

হয়। আগেই বলা হয়েছে, আয়োডিনের অভাবে আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয় না। এ-অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থি শরীরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতিরিক্ত হরমোন তৈরি করার চেষ্টা করে। মুল উপাদান আয়োডিনের ঘাটতি থেকে যাওয়ার পরও যখন গ্রন্থিটি আয়োডিন তৈরির বৃথা চেষ্টা করে তখন তা আকারে বড় হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এটি চোখে পড়ে না, কিন্তু ধীরে-ধীরে বড় হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দৃশ্যমান হয়।

প্রজনন সমস্যা

গর্ভকালীন সময়ে থাইরয়েড হরমোন শতকরা ৫০ ভাগ বেশি উৎপন্ন হয়। এই অতিরিক্ত থাইরয়েড

হরমোনের জন্য বেশিমাত্রার আয়োডিনের প্রয়োজন পড়ে। গর্ভধারণের ১১ সপ্তাহ থেকে ভ্রূণের থাইরয়েড গ্রন্থি কাজ শুরু করে। ১৮ থেকে ২০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে ভ্রূণ তার নিজস্ব থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন শুরু করে। সেই সময় থেকে শিশুর ৩ বছর বয়স পর্যন্ত সঠিক মাত্রার আয়োডিন গ্রহণ মা ও শিশু উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় মস্তিষ্ক এবং অন্ত্র খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এসময় আয়োডিনের অভাব হলে বা পর্যাপ্ত আয়োডিন না-পেলে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতিসহ আয়োডিন ঘাটতিজনিত নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। আয়োডিনের খুব বেশি অভাব দেখা দিলে গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব কিংবা অপরিণত শিশুর জন্ম হতে পারে। এই সন্তান বেঁচে থাকলেও জন্মগত নানা সমস্যায় ভোগে। এর ফলে, সন্তান হাবাগোবা হয়, ভালোভাবে কথা বলতে পারে না কিংবা একেবারে

বোবা হয়, কানে কম শোনে এবং শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় বামন আকৃতির থেকে যায়।

শিশু-মৃত্যু

আয়োডিনের অভাবগ্রস্ত শিশুরা অন্যান্য শিশুর চাইতে বেশিমাত্রায় অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগে এবং তাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে। ফলে, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকিও বেশি থাকে।

আয়োডিন গ্রহণের সঠিক মাত্রা নির্নয়

আমরা সঠিক মাত্রায় আয়োডিন খাচ্ছি কি না তা পরিমাপ করা যায় প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত আয়োডিনের পরিমাণ থেকে। নানা রকম খাবারের মাধ্যমে আমরা যে আয়োডিন খাই তার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তাই প্রস্রাবে আয়োডিনের মাত্রা জানার মাধ্যমে বুঝতে পারি আমরা সঠিক পরিমাণে আয়োডিন খাচ্ছি কি না। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মানুষের শরীরে আয়োডিনের অবস্থা পরিমাপ করার জন্য তাদের প্রস্রাবে আয়োডিনের মাত্রা একটি ভালো সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রতিলিটার প্রস্রাবে গড়ে আয়োডিনের মাত্রা যখন ১০০-২০০ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি নেই।

প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত আয়োডিনের সাথে আয়োডিন গ্রহণের সম্পর্ক বোঝাবার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ও অন্য কয়েকটি সংস্থা নিচের সারণি ব্যবহার করে থাকে:

প্রস্রাবে আয়োডিনের গড় মাত্রা (মাইক্রোগ্রাম/লিটার)	গড় আয়োডিন সেবন (মাইক্রোগ্রাম/লিটার)	শরীরে আয়োডিনের পুষ্টিগত অবস্থা
<২০	<৩০	আয়োডিনের চরম ঘাটতি
২০-৪৯	৩০-৭৪	মাঝারি-পর্যায়ের ঘাটতি
৫০-৯৯	৭৫-১৪৯	স্বল্পমাত্রার ঘাটতি
১০০-১৯৯	১৫০-২৯৯	আদর্শ (সঠিক) মাত্রায় আছে
২০০-২৯৯	৩০০-৪৪৯	প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আছে

বাংলাদেশের মাটি, ফসল ও মানুষের শরীরে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যা

সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে যে আয়োডিন আছে তা সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে মেঘের সঙ্গে আকাশে উঠে যায়। বৃষ্টির মাধ্যমে তা মাটিতে এসে পড়ে। গাছপালা মাটি থেকে এই আয়োডিন শোষণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, বন্যা, ইত্যাদির কারণে মাটির এই আয়োডিন ধুয়ে আবার সমুদ্রে চলে যায়। এসব কারণে আমাদের দেশের মাটিতে ও ফসলে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে, এখানকার মানুষের মধ্যে আয়োডিন ঘাটতির ঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে বিস্তীর্ণ নদীর অববাহিকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠির মধ্যে এই সমস্যা প্রকট কারণ প্রায় প্রতিবছর বন্যার সময় এসব এলাকার ফসল উৎপাদনকারী জমিজমা পানিতে তলিয়ে যায়। বন্যার পানি সরে যাওয়ার সময় মাটি থেকে আয়োডিনও ধুয়ে চলে যায়।

২০০৪-২০০৫ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে: শিশুদের শতকরা ৬.২ ভাগ এবং মহিলাদের ১১.৭ ভাগ গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত। ১৯৯৩ সালে এই হার ছিলো যথাক্রমে শতকরা ৪৯.৯ ভাগ ও ৫৫.৬ ভাগ। ২০০৪-২০০৫ সালের সমীক্ষায় শিশুদের প্রস্রাবে আয়োডিন পাওয়া গেছে প্রতিলিটারে ১৬২ মাইক্রোগ্রাম এবং মহিলাদের প্রস্রাবে ১৪০ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৯ সালে এই মাত্রা ছিলো যথাক্রমে ৫৪ মাইক্রোগ্রাম ও ৪৭ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী আয়োডিনের অভাব ছিলো বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে ৭০.২ ভাগ। ২০০৫ সালে এই হার নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৩.৮ ভাগ ও ৩৮.৬ ভাগে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ-দেশে আয়োডিনের ঘাটতি লাঘবের জন্য গৃহীত জাতীয় প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এখনও আমাদের দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক আয়োডিনের ঘাটতিজনিত নানা সমস্যায় ভুগছে। ২০০৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪.০ ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪.৫ ভাগ আয়োডিনের চরম স্বল্পতায় ভুগছে। তাই আয়োডিনের এই ঘাটতি লাঘবে আমাদেরকে আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়

আয়োডিনের এই ঘাটতিজনিত সমস্যা দূর করার জন্য আমাদের অবশ্যই খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। এর সবচেয়ে ভালো এবং সহজ উপায় হলো আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া। আমাদের দেহে বেশি আয়োডিন জমা থাকে না, তাই নিয়মিত অল্প পরিমাণে আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ শুষ্ক স্থানে, সূর্যের আলো থেকে দূরে এবং আবদ্ধ পাত্রে রাখতে হবে। নতুবা লবণে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যাবে।

আপনার শিশুর জন্মগত হৃদরোগ আছে কি না কী করে বুঝবেন

এম করিম খান
রেনেসা হসপিটাল, ধানমণ্ডি, ঢাকা
মাসুমা আক্তার খানম
আইসিডিডিআর,বি

অধিকাংশ দম্পতির কাছে বিধাতার সবচেয়ে বড় উপহার একটি সুস্থ শিশু। শুধু মা-বাবাই নন, একটি সুস্থ শিশু ভূমিষ্ট হলে পরিবারের সবাই যারপরনাই খুশি হন। যদি কোনো ত্রুটি নিয়ে শিশুর জন্ম হয় তবে তা যেকোনো পরিবারে এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি করে।

শিশুর জন্মগত ত্রুটিগুলো প্রধানত দুই ধরনের হয়: (১) যা দেখামাত্রই বোঝা যায়, যেমন ঠোঁট-কাটা, তালু-কাটা, আঙুলের সংখ্যা বেশি বা কম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক আকৃতি, ইত্যাদি এবং (২) যে-ত্রুটি চোখে দেখে বোঝা যায় না, কেবল ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। জন্মগত হৃদরোগ এমনি একধরনের ত্রুটি যা চোখে দেখে বোঝা যায় না।

অবশ্য কোনো শিশু জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে জন্মেছে কি না এ-বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায়। একটু খেয়াল করলেই যেকোনো শিক্ষিত মা-বাবা বা আত্মীয়-স্বজন তা আঁচ করতে পারেন। এ-বিষয়ে একটা সত্যি ঘটনা বলা যাক:

ক'দিন আগে এই রচনার প্রথম লেখকের কাছে চিকিৎসার জন্য এক মহিলা তাঁর গর্ভজাত ১০ মাসের একটা ছেলে নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটির নাম দীপু। তিনি শিশুটির মায়ের কাছে জানতে চাইলেন ওর সমস্যাগুলো কী কী। মহিলা বললেন:

"জন্মের পর থেকেই দেখছি আমার বাচ্চা ঠিকমত খেতে পারে না, বুকের দুধ খেতে গেলে হাঁপিয়ে ওঠে; একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার একটু খায়; বেশি-বেশি ঘামে; প্রায়ই সর্দি-কাশি হয়, এমনকি নিউমোনিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয়। এর সঙ্গে ওজনও বাড়ছে না; এখনো ভালো করে বসতে পারে না; ক্যামন যেন হাইফাই করে; অন্যান্য বাচ্চার মত প্রাণচঞ্চল নয়।"

এপর্যন্ত বলে মহিলা একটু থামলেন। চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন কান্নাকাটি করলে তাঁর বাচ্চার গায়ের রঙ নীল বা কালচে হয়ে যায় কি না? শিশুটির মা জানালেন ইদানীং তাঁর সেরকমই মনে হয়। তিনি আরো বললেন জন্মের পর থেকে তিনি তাঁর শিশুকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাইয়েছেন, এখনো বুকের দুধ দিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় সবগুলো টিকাও দিয়েছেন।

এসব কথা শুনে চিকিৎসক বুঝলেন এপর্যন্ত মহিলা তার শিশুর জন্য যা যা করেছেন সবই ঠিক ঠিক করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাও খুবই ভালো। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর চিকিৎসকের মনে হলো দীপুর জন্মগত হৃদরোগ আছে। তিনি দীপুর একটা এক্স-রে এবং ইকোকার্ডিওগ্রাম করালেন। ইকোর রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর ধারণাই সত্যি হলো—অর্থাৎ দীপুর জন্মগত হৃদরোগ আছে।

জন্মগত হৃদরোগ কেন হয়

জন্মগত হৃদরোগ কেন হয় তার সবকিছু সম্পর্কে আমরা এখনো জানি না। তবে এটুকু জানা গেছে: জন্মগত হৃদরোগ বহু সমস্যার কারণে হতে পারে। গর্ভবতী অবস্থায় মা-র যদি জার্মান মিজিল্‌স্ বা হাম হয় বা অন্য কোনো ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ ঘটে তবে গর্ভজাত সন্তান হৃদরোগ নিয়ে জন্মাতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে কিছু অষুধ খেলে শিশুর হৃৎপিণ্ডে জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে বারবার এক্স-রে করালে, মা-বাবার বংশগত কোনো হৃৎপিণ্ডজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা থাকলে, গর্ভাবস্থায় ধূমপান ও মদ্যপান করলে, মা-র অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) থাকলে এরকম হতে পারে। তবে, অনেক সময় তেমন কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রতিকার

যেকারণেই হোক, জন্মগত হৃদরোগ এখন আর তেমন ভয়ের কোনোকিছু নয় কারণ প্রায় সব ধরনের জন্মগত হৃদরোগের শৈল্য-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে।

নবজাতকের জন্ম-ওজন কম হলে কী করবেন

অর্জুন চন্দ্র দে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
লক্ষ্মী সাহা
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
এএম শামসির আহমেদ
আইসিডিডিআর,বি

একটি শিশু যে-ওজন নিয়ে জন্ম নেয় তাকে তার জন্ম-ওজন বলা হয়। একটি স্বাভাবিক শিশুর জন্ম-ওজন ২,৫০০ গ্রাম থেকে ৪,০০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। যে-শিশুর জন্ম-ওজন ২,৫০০ গ্রামের কম তাকে কম জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু বলে গণ্য করা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে: বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ২২ ভাগ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তা নবজাতকের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণও বটে।

মায়ের সমস্যা এবং নবজাতকের নিজের সমস্যা—এই দুই কারণেই একটি শিশু কম ওজন নিয়ে জন্ম নিতে পারে।

মায়ের যেসব সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে নবজাতকের জন্ম-ওজন কম হতে পারে সেগুলো হলো:

- কম বয়সে বিয়ে এবং গর্ভধারণ
- বেশি বয়সে গর্ভধারণ
- ঘনঘন সন্তান গ্রহণ
- মায়ের অপুষ্টি
- গর্ভাবস্থায় যোনিপথে রক্তপাত
- সময়ের আগেই পানি ভেঙে-যাওয়া কিংবা প্রসব ব্যথা শুরু-হওয়া
- মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক চাপ
- ধুমপান কিংবা মাদকাসক্তি
- উচ্চ রক্তচাপ, রক্তশূন্যতা, কিডনির রোগ, হৃদরোগ, লিভারের রোগসহ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী রোগ

শিশুর নিজের যেসব সমস্যার কারণে তার জন্ম-ওজন কম হতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- অপরিণত অবস্থায় (অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহ গর্ভকালীন সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই) জন্ম-নেওয়া
- জন্মগত ত্রুটি
- গর্ভে একাধিক শিশুর অবস্থান (যমজ শিশুর জন্ম)
- জন্মগত কোনো সংক্রমণ

কম-ওজনের নবজাতকদের সমস্যা বা জটিলতা

কম-ওজনের নবজাতকদের নানা ধরনের জটিলতার মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয় ও অধিকতর তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- শরীরের তাপমাত্রা কমে-যাওয়া (hypothermia)
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে-যাওয়া (hypoglycaemia)
- সংক্রমণ (sepsis)

শরীরের তাপমাত্রা কমে-যাওয়া

একটি নবজাতক শিশু স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকা জরুরি। নবজাতকের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৭.৫ থেকে ৯৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট। কম-ওজনের শিশুদের চামড়ার নিচে চর্বির আবরণ অত্যন্ত হালকা

থাকে বলে তাদের তাপের নির্গমন স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় বেশি হয়। এদের খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে কম থাকে। ফলে, শরীরে তাপের উৎপাদন কম হয়। অধিকন্তু, স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় নড়াচড়া কম করার কারণেও এদের শরীরে তাপের উৎপাদন কম হয়। এসব কারণে এদের শরীরে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে-যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

করণীয়

কম-ওজনের শিশুকে উষ্ণ পরিবেশে রাখা জরুরি। শিশুকে যে-ঘরে রাখা হয় সেখানে, বিশেষ করে শীতকালে, হিটার দিয়ে গরম রাখলে তা শিশুর জন্য উপকারী হয়। তাছাড়া, পুরো শরীর ঢেকে রাখে এমন সূতি-কাপড়ের পোষাক ও হাতে-পায়ে মোজা পরিয়ে রাখতে হবে। লক্ষণীয় যে, শিশুদের মাথার আয়তন শরীরের অন্য অংশের তুলনায় বেশি। এজন্য তার মাথা কাপড়ে ঢেকে রাখাটা জরুরি। তবে, মনে রাখতে হবে: অতিরিক্ত কাপড়-চোপড়ে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কোনো কষ্ট না-হয় বা শিশু যেন ঘেমে না-যায়।

রক্তে গ্লুকোজ কমে-যাওয়া

এমনিতেই নবজাতক শিশুর লিভার তুলনামূলকভাবে অপরিপক্ক থাকে। কম-ওজনের শিশুর লিভার আরো বেশি অপরিপক্ক। অধিকন্তু, এরা পর্যাপ্তভাবে বুকের দুধ খেতে পারে না। ফলে, এদের রক্তে গ্লুকোজ কমে-যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—যা শিশুর জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

করণীয়

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমিত রাখার জন্য বারবার বুকের দুধ খেতে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে: কম-ওজনের শিশু একবারে বেশি পরিমাণে অথবা বেশিক্ষণ ধরে দুধ খেতে পারে না। এজন্যই এদেরকে বারবার দুধ খাওয়াতে হবে। অনেক মা অবশ্য তার ভ্রান্ত ধারণা থেকেই ভেবে বসেন তার শিশু পর্যাপ্ত দুধ পাচ্ছে না। লক্ষণীয় যে, শিশুর ওজন যদি সন্তোষজনকভাবে বাড়তে থাকে এবং শিশু যদি পর্যাপ্ত প্রস্রাব করে তবে বুঝতে হবে সম্ভবত বুকের দুধের পরিমাণগত কোনো সমস্যা নেই।

নবজাতকের সংক্রমণ বা সেপসিস

নবজাতকের সংক্রমণ বা সেপসিস একটি মারাত্মক রোগ এবং আমাদের দেশে নবজাতকের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। জন্মের পর প্রথম মাসটিতে অন্য যেকোনো বয়সের তুলনায় সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি থাকে। তবে কম-ওজনের শিশুর শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় কম থাকে বলে এদের মধ্যে সংক্রমণের আশঙ্কাও বেশি। উল্লেখ্য যে, নবজাতকের সংক্রমণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জটিল আকার ধারণ করার সম্ভাবনা থাকে।

সংক্রমণ বা সেপসিস আছে কি না তা বোঝার উপায়

নবজাতক শিশু কোনো জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হলে সবার আগে যে-লক্ষণগুলো চোখে পড়ে তা হলো: শিশুর নড়াচড়া কমে যায়, ঘুম-ঘুম ভাব বেড়ে যায় এবং বুকের দুধ-খাওয়া অস্বাভাবিক মাত্রায় কমে যায়। এছাড়া, জ্বর-আসা অথবা তাপমাত্রা কমে-যাওয়া, ঘন ঘন বমি-হওয়া, পেট ফুলে-যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, রক্তক্ষরণ, ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

করণীয়

কোনো শিশু যেন সেপসিস রোগে আক্রান্ত হতে না-পারে সেজন্য সতর্ক থাকাটাই বেশি জরুরি। শিশুকে কোলে নেওয়ার আগে প্রতিবার হাত-ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়ে রাখতে হবে এবং পরিষ্কার বিছানায় শোয়াতে হবে। শিশুর পরিচর্যাকারী লোকের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। যে-ঘরে শিশুকে রাখা হয় সেখানে মা ও শিশুর পরিচর্যাকারী ছাড়া অন্যান্যদের অবাধ আসা-যাওয়া কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিশুকে

জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষা এবং সেপসিস প্রতিরোধেও অত্যন্ত জরুরি।

সেপসিস-এর কোনো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে অথবা ন্যূনতম সন্দেহ হলে দেরি না-করে শিশু-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে হবে অথবা জরুরি ভিত্তিতে নিকটস্থ হাসপতালে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে: সেপসিস-এর জন্য শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও কম-ওজনের শিশুর আরও যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে:

- শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বা রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম (RDS)
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (intraventricular haemorrhage)
- জন্ডিস
- প্যাটেন্ট ডাকটাস আরটারিওসাস নামের একটি হৃদরোগ
- বৃহদান্ত্রের প্রদাহ (necrotizing enterocolitis)

নবজাতককে কখন হাসপাতালে ভর্তি করবেন

- যদি ৩৪ সপ্তাহ গর্ভ পূর্ণ হওয়ার আগেই জন্ম নেয়
- যদি জন্ম-ওজন ১,৮০০ গ্রামের কম হয়
- নবজাতক কোনো ধরনের অসুস্থতায় ভুগছে এমন বোঝা গেলে

নবজাতকের কম জন্ম-ওজন প্রতিরোধের কয়েকটি উপায়

- ১৮ বছরের কম বয়সের কোনো মেয়েকে বিয়ে না-দেওয়া/গর্ভধারণ না-করা
- ঘন ঘন সন্তান ধারণ না-করা (২ বছরের মধ্যে পুনরায় সন্তান না-নেওয়া)
- মায়ের রক্তশূন্যতা রোধ করা এবং খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা
- গর্ভাবস্থায় সঠিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং পরিমিত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী মহিলার ধূমপান পরিহার করা
- অবিবাহিত মহিলাদের রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া
- গর্ভাবস্থায় নিয়মিত চেক-আপ করানো

মনে রাখতে হবে: শিশুর ওজন যত কম, জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ততই বেশি। গর্ভ ৩৪ সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগে শিশুর জন্ম হলে অথবা জন্ম-ওজন ১,৮০০ গ্রামের কম হলে তার সমস্যা অন্য শিশুদের তুলনায় বেশি দেখা যায়। অতএব, তাদের বেলায় বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরি।

13th Annual Scientific Conference of ICDDR,B

Call for Abstracts

The 13th Annual Scientific Conference (ASCON XIII) of ICDDR,B is going to be held at the Pan Pacific Sonargaon Dhaka from 15 to 17 March 2011. This forum provides an opportunity to disseminate and share results of research, experience, and lessons learnt from recent projects and programmes in Bangladesh and the region.

Interested persons are invited to submit abstracts keeping the theme of the conference—Science to Accelerate Universal Health Coverage—in mind. The sub-themes are:

Policy and regulatory frameworks: Critical analysis of existing Universal Health Coverage (UHC) policy and regulatory frameworks to inform governments embarking upon reforms towards UHC;

Disease burden and healthcare priorities: Analysis of how health needs and priority interventions for infectious, non-communicable and other conditions can inform the identification of benefit packages for UHC;

Service infrastructure and health workforce: Assessing how critical inputs to services delivery, such as infrastructure, supply chains and the health workforce, have been, or should be, managed in the design and implementation of UHC strategies;

Financing: Examining the array of pre-payment financing mechanisms, including community-based mutuals, employer-based social health insurance, tax-based and hybrid arrangements involving international donor assistance;

Measurement, monitoring and health information systems: Examine the design of health and management information systems that provide accurate and timely data to inform decisions and monitor progress towards UHC with a special focus on measures of 'coverage' and the innovative use of information and communications technologies (ICTs);

Equity: Practical experience, rights and entitlements, methods and measures that ensure equity in health and healthcare informs the design, implementation and evaluation of efforts towards UHC;

Experience in Universal Health Coverage: Share analysis of recent programmatic experiences in UHC with a focus on developing countries.

Issues indirectly related to Universal Health Coverage will also be considered for presentation.

Abstracts should be forwarded to ascon13@icddrb.org or be submitted online: http://www.icddrb.org/ascon13 by 15 December 2010 at the latest. More details are available at http://www.icddrb.org/ascon13.